# XXXII : THE INDIAN NATIONAL CONGRESS (I. N. C.) [1885 AD-1905 AD]

# XXXIII : EARLY NATIONALISTS


| | |
|---|---|
| 32.1 | Establishment of Indian National Congress in 1885 : First Period : Moderate Age : Social Basics of Moderate Movement : Weakness of Moderate Movement. |
| 32.2 | Activities of Indian National Congress in the First Period (1885-1905 AD) |
| 32.3 | Social Basics of Moderate Leaders in I.N.C. |
| 33. | Causes behind the Rise of Militant Nationalism. |


## 32.1 ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা : প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেসের আন্দোলন : মডারেট যুগ : নরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি : নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা (Establishment of Indian National Congress in 1885 : First Period : Moderate Age : Social Basics of Moderate Movement : Weakness of Moderate Movement)

● ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা:

উনিশ শতকে আঞ্চলিক স্তরে যখন রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ভারতসভা ১৮৮৩ এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। ডঃ সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন, "From the early 1880s onwards, there had been numerous suggestions and attempts at a coming together of such groups on an all India scale..." ("১৮৮০-র দশকের প্রথম থেকেই আঞ্চলিক সমিতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বভারতীয় স্তরে একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব ও প্রয়াস নেওয়া শুরু হয়েছিল")। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সে (All India National Conference) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ওই সময় অবসরপ্রাপ্ত জনৈক ইংরেজ আমলা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক জাগরণ ঘটানোর জন্য শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার আবেদন জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ছাত্রদের কাছে একটি খোলা চিঠিতে এই আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বম্বেতে অনুষ্ঠিত লর্ড রিপনের বিদায় সভায় সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আলোচিত হলেও তা আলোচনার স্তরেই থেকে যায়। হিউম এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে বম্বেতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বসে (৭২ জন প্রতিনিধি বম্বের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "A new era in the political life of India began with the foundation of the Indian National Congress towards the very end of the year 1885." (১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়")। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যে তা ভারতের প্রধান জাতীয়তাবাদী সংস্থায় পরিণত হয়। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কংগ্রেসই ছিল একমাত্র জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচেষ্টায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের পতাকা তলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদের অন্যতম জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার-এর মতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী থেকে জাতীয় কংগ্রেস গঠ

পরিকল্পনা সৃষ্টি হয়। শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত বলেন যে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে থিওসফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে ''স্বদেশ রক্ষার জন্য একটি জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা আসে'' এবং জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। শ্রীমতি বেসান্তের এই বক্তব্য যুক্তিসংগত নয়, কারণ বেসান্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানকারী সতেরো (১৭ জন) জন সদস্যের মধ্যে এমন অনেক নেতার নাম করেন যারা তখন মাদ্রাজে উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীমতি বেসান্ত সুরেন্দ্রনাথের উপস্থিতির কথা বললেও তিনি তখন মাদ্রাজে ছিলেন না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীমতি বেসান্তের মতকে অস্বীকার করেছেন। অনেকের মতে দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু দীনশা ওয়াচা এই মতকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। সম্ভবত হিউম আয়োজন করেন বলে ডঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। কিন্তু এই মতও গ্রহণীয় নয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ডঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'জাতীয় সম্মেলন' থেকে 'জাতীয় কংগ্রেসের' পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোনো প্রতিষ্ঠা করার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অম্বিকাচরণ মজুমদারের মতে, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'জাতীয় সম্মেলন' থেকে হিউমের অবদান অনস্বীকার্য। আবার অনেকে মনে করেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কোনো ঐতিহাসিকের মতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিউমের অবদান ছাড়া জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস ক্ষেত্রে হিউমের ভূমিকা গৌণ, কারণ তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিউমের অবদান ছাড়া জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থের পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে, অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি মন্তব্য করেন যে, তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায়। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিউম সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলেন। ডাফরিন হিউমের প্রস্তাবকে সংশোধন করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলেন। ডাফরিনের প্রস্তাব অনুযায়ী হিউম ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার করে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ডঃ সুমিত সরকার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে হিউম ও ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একমত ছিলেন না।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত তাঁর 'India Today' গ্রন্থে বলেছেন যে, ব্রিটিশ শাসকদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে হিউম কংগ্রেস গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ন রচিত 'Allan Octovian Hume', 'Father of the Indian National Congress' (1913) এবং উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী লিখিত 'Introduction to Indian Politics' (1898) নামক গ্রন্থ থেকে রজনীপাম দত্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। লর্ড লিটনের শাসনকালে হিউম সরকারের উচ্চ সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তাঁর হাতে সাতখণ্ড গোপন নথিপত্র আসে যাতে প্রায় ত্রিশহাজার বিদ্রোহের রিপোর্ট ছিল। এই নথিপত্র থেকে হিউম জানতে পারেন যে, ভারতের শোষিত নির্যাতিত অবস্থায় দরিদ্র জনগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমশ সরকারের প্রতি তাদের আস্থা হারাচ্ছে। এই অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি যদি সাধারণ মানুষদের নেতৃত্ব দেয় তাহলে বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। শিক্ষিত যুবকেরা যাতে এতে অংশগ্রহণ না করে সেই উদ্দেশ্যে হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এই বিদ্রোহ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য লর্ড ডাফরিনকে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। ওয়েডারবার্নের মতে, ''ভারতে এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় তা নিরাপদে বহির্গত করার জন্য সেফটি ভালভ (Safety Valve)—এর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ব্রিটিশ শাসকেরা চেয়েছিলেন গণবিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাদের 'রক্ষা কবচ' বা সেফটি ভালভ রূপে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হোক। রজনীপাম দত্তের মতে—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের মস্তিষ্ক প্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিনিধি হিসাবে হিউম এক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির মতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ডাফরিনের পরামর্শ অনুযায়ী পুনায় ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরে এই অধিবেশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির নাম রাখা হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (Indian National Congress)। এস. আর. মেহরোত্রা তাঁর 'The Emergence of the Indian National Congress' গ্রন্থে সেফটি ভালভের তত্ত্বের সপক্ষে বহু প্রমাণ দিয়েছেন। আর. সি. দত্তের মতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যাতে ব্রিটিশের প্রতি অনুগত থাকে তার জন্য লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সপক্ষে মত দেন। বর্তমানে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সুমিতকুমার ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, ''কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ ও তার সহযোগীদের দূরদর্শী একটি গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবকে যে কোনো উপায়ে প্রতিহত করা। পরবর্তী কালেও কংগ্রেস কখনোই তার প্রতিষ্ঠাতাদের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি।''

সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় হিউমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য কিছু হিউমের বক্তব্যকে ঘিরে অনেক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব হিউম গোয়েন্দা বিভাগের গোপন তথ্য দেখার সুযোগ কীভাবে পেয়েছিলেন? দ্বিতীয়ত, হিউম ছিলেন সিমলায়, গোপন নথিপত্র ছিল দিল্লিতে। সিমলায় বসে তিনি কীভাবে নথি দেখার সুযোগ লাভ করেন? তৃতীয়ত, এগুলি কোনো সরকারি নথির নয়। প্রকৃতপক্ষে হিউম এই সময় থিওসফিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হন। আর. সি. দত্ত বলেছেন সেই বিদ্রোহ হিউম ও তাঁর থিওসফিস্ট গুরুদের কল্পনাপ্রসূত। লালা লাজপত রায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি হিউম গণবিদ্রোহের আশঙ্কায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তবে বিদ্রোহের জন্য কেন তিনি সাত বছর কেন অপেক্ষা করেছিলেন? তিনি

ডাফরিন হিউমের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেও তিনি এই পরিকল্পনা সন্দেহের চোখে দেখতেন। অমলেশ ত্রিপাঠী এই বক্তব্যের সমর্থনে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫-১৯০৭ খ্রিঃ) গ্রন্থে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর গভর্নর রিএ-কে (Reay) লিখিত ডাফরিনের চিঠির উল্লেখ করেছেন। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে হিউমের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল? ঐতিহাসিক অনিল শীল মন্তব্য করেছেন যে, হতাশায় পরিপূর্ণ হিউম আসন গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সচেষ্ট হন। লর্ড রিপন ও লর্ড ডাফরিন যে তাঁর কাছের লোক, একথা বুঝিয়ে তিনি নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হিউমের চিন্তার ফসল—একথা ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। উনিশ শতক ধরে গড়ে ওঠা সমিতিগুলির মাধ্যমে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান করে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। অনিল শীলের মতে, হিউম যদি বম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশন না ডাকতেন, তাহলেও একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হত। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, হয়ত সেক্ষেত্রে এই সম্মেলন কলকাতায় বসত আর সুরেন্দ্রনাথ হতেন তার নায়ক। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র তিনজন বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে বাদ দিয়ে কোনো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন তখন সম্ভব ছিল না। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করায় কংগ্রেস সত্যই জাতীয় চরিত্র লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার যথার্থ পটভূমি নিয়ে এখনও রহস্যের অবসান ঘটেনি। ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার বলেন যে, হিউম ও ডাফরিনের সতর্ক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সেফটি ভালভ হিসেবে কতটা কাজ করেছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। রজনীপাম দত্ত বলেন, ''হিউম, ডাফরিন ও ব্রিটিশ আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফলেই কংগ্রেস গঠিত হয়।'' যাই হোক রাজনৈতিক ঘটনাটি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের পটভূমি তৈরি রাখলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

## 32.2 প্রথম পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ (১৮৮৫-১৯০৫ খ্রিঃ) (Activities of Indian National Congress in the First Period (1885 - 1905 AD)

সকল ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে ব্রিটিশ বিরোধী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উদ্ভব ঘটে (১৮৮৫ খ্রিঃ)। উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে নেওয়া কংগ্রেস কথাটির অর্থ হল 'জনগণের সমাবেশ' বা সম্মেলন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় ষাট বছর এই প্রতিষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত করেছিল। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, জনমানসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনকে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। বম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন মন্তব্য করে যে, ''কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বদেশবাসের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হল'' (An epoch in the political history to our countrymen)। 'ইন্ডিয়ান মির'র পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেন যে, ভারতে জাতীয় পার্লামেন্ট গঠিত হল। **'ইন্দু প্রকাশ'** পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, এ এক নতুন জীবনের সূচনা করেছে।......এ জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে এবং একই অনুভূতি ও একই লক্ষ্য নিয়ে দূরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে খুব সাহায্য করবে।'

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বম্বেতে এবং এর সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় দাদাভাই নৌরোজীর নেতৃত্বে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দীন তায়েবজী। এলাহাবাদে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ অধিবেশনে জর্জ ইয়ুল, বম্বেতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চম অধিবেশনে স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন, কলকাতায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে সপ্তম অধিবেশনে পি. আনন্দ চালু, এলাহাবাদে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, লাহোরে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের নবম অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী, মাদ্রাজে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের দশম অধিবেশনে আলফ্রেড ওয়েব, পুনেতে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের একাদশ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের দ্বাদশ অধিবেশনে রহিমতুল্লা এম. সায়ানি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বেনারস অধিবেশনে গোপালকৃষ্ণ গোখেল, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অধিবেশনে দাদাভাই নৌরোজী এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাট অধিবেশনে রমেশচন্দ্র দত্ত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন ধরনের দাবি সরকারের কাছে পেশ করা হত। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এই যুগের নেতারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন বলে এঁদের 'নরমপন্থী' বলা হয়। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৭ জন বম্বে এবং মাদ্রাজ থেকে ২২ জন এসেছিলেন। অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৯ জন ছিলেন আইনজীবি, ১৪ জন সাংবাদিক, ১ জন চিকিৎসক ও ২ জন শিক্ষিকা ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হবার পরবর্তী কুড়ি বছর কংগ্রেস পরিচালিত হয়েছিল দাদাভাই নৌরোজী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, আনন্দ চার্লু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রমুখের দ্বারা।

কংগ্রেসের প্রথম পর্যায়ের নেতারা সকলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং কংগ্রেসের দীক্ষিত আইনজীবীদের প্রাধান্য ছিল বলে অনিল শীল এই প্রতিষ্ঠানকে 'উকিল রাজ' বলে অভিহিত করেছেন। এই উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এঁরা 'নরমপন্থী' বা 'Moderate' নামে পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র নরমপন্থী নেতাদের 'জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। তবে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের কথা না বললে জাতীয়তাবাদী বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের র‍্যাডিক্যাল লেখকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত মানুষের প্রতিষ্ঠান।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নিযুক্ত হন। প্রথম অধিবেশনেই জাতীয় কংগ্রেসের চারটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়—(ক) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশের স্বার্থে আত্মনিবেদন ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও মৈত্রী গঠন করা; (খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার বাধা অতিক্রম করে দেশপ্রেমিকের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করা; (গ) ভারতের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান নির্ণয়; (ঘ) পরবর্তী এক বছর দেশীয় রাজনীতিবিদেরা কি নীতি ও পন্থা নিয়ে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করবেন তা স্থির করা। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই পরবর্তী কুড়ি বছরের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। এই সময় কংগ্রেসের কার্যাবলি দুটি সূত্রের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়েছিল। **প্রথমত**, ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে গতি সঞ্চার করা। **দ্বিতীয়ত**, ভারতের অগ্রগতির পথে যে সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলিকে দূর করা এবং ভারতের জনগণ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলা। কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন যে তাঁরা শুধুমাত্র ভারতে জনমত গঠনে সাহায্য করবেন তা নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও ভারতের স্বপক্ষে জনমত গঠনে সক্ষম হবেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস ইংল্যান্ডে 'ব্রিটিশ কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি 'ইন্ডিয়া' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তার মাধ্যমে ব্রিটিশ জনগণের কাছে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে থাকেন। ব্রিটেনে ভারতের অনুকূলে জনমত গঠনে দাদাভাই নৌরোজীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে চারটি উদ্দেশ্য ঘোষিত করার পর নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি হল—(১) ভারতের প্রশাসনের ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগ; (২) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে আইন সভা স্থাপন; (৩) ভারত সচিবের পরামর্শ বিলোপ সাধন; (৪) বড়োলাট ও প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য এবং সদস্যদের অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের; (৫) সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস; (৬) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আধুনিক শিল্প বিকাশ; (৭) শুল্ক সংরক্ষণ; (৮) ভূমি রাজস্ব হ্রাস; (৯) ভারতে ও ইংল্যান্ডে একযোগে আই. সি. এস পরীক্ষা গ্রহণ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ এবং (১০) প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। এই সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়াও তাঁরা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র ও বাক্ স্বাধীনতার দাবি পেশ করা হয়। কংগ্রেসের এই সমস্ত দাবির মধ্যে স্বরাজ দাবির সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে ইংরেজদের কিছু পত্র-পত্রিকা দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়। টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করে যে, কংগ্রেসের দাবি পূরণ করার অর্থ হল ভারতবাসীকে ক্রমশ স্বায়ত্তশাসন প্রদান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের মুসলিম প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেয়নি। মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেস থেকে দূরে ছিল। যাই হোক কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সদস্যদের অধিকার বৃদ্ধির দাবি করা হয়। এই দাবিগুলিতে দৃঢ়তা ও অভিযোগ স্পষ্ট ছিল। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের নমনীয় সুর হঠাৎ দাবির সুরে পরিণত হওয়ার জন্য বাংলার উগ্র প্রভাবকেই দায়ী করেন। এই সময় থেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা শুরু হয়। আলিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ মুসলিমদের নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশের প্রতি অনুগত থাকতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। লর্ড ডাফরিন ভারতীয় প্রশাসন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি পার্লামেন্টারি কমিশন গঠনের আশ্বাস দেন এবং আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে মাদ্রাজে। বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে ৬০৭ জন সদস্য যোগদান করে। এই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ যুবা সদস্যেরা একটি সংবিধান রচনার দাবি জানালে ৩৪ জন সদস্যের একটি সমিতির উপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও এই সংবিধান দীর্ঘদিন কার্যকরী হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ, দীনশা ওয়াচা, আনন্দ চার্লু, বিজয়রাঘবাচারি প্রমুখের নির্দেশে কংগ্রেসের কাজকর্ম চলতে থাকে। মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসের জন্য তহবিলে স্বেচ্ছা-দানের টাকা তোলা হয়। এই অধিবেশনে বদরুদ্দীন তায়েবজী স্যার সৈয়দ আহমদকে কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান জানান।

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলির মধ্যে শাসন সংস্কার, বড়োলাটের ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ (২ জন ও ১ জন), সরকারি পদে ভারতীয়দের নিয়োগ, আইন সভায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে ভারতীয়দের নিয়োগ, জুরি প্রথার প্রবর্তন, অস্ত্র আইন রদ প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

স্বায়ত্ব শাসনের দাবি করা হয়নি। মডারেট নেতারা সর্বসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাননি। জাতির স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী এবং একমাত্র যারা ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছে তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারে—এরকম সংকীর্ণ মনোভাব মডারেট নেতাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে সরকারি মনোভাব কংগ্রেসের প্রতি অনুকূল ছিল। কিন্তু সরকার ক্রমশ কংগ্রেসের কার্যকলাপের ফলে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ডাফরিন বলেন যে, কংগ্রেস মুষ্টিমেয় ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান (mirconscopic minority of Indian People)। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বলেন যে, কংগ্রেসকে শান্তিতে সমাহিত করা তাঁর একটি মহৎ ইচ্ছা। কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস করার জন্য সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির নীতি অনুসরণ করে এবং কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়। তবে সরকারি বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবিগুলির বেশিরভাগই ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। তাঁরা 'সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব'-এর মাধ্যমে ভারতের সম্পদ কীভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে তা জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফল দেখিয়ে দাদাভাই নৌরোজী 'Poverty and Un-British Rule' (পোভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল) গ্রন্থে ব্রিটিশ শাসনে শোষণের স্বরূপ শিক্ষিত জনগণের কাছে তুলে ধরেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'Economic History of India' (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া) গ্রন্থে 'Drain Theory' বা সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের দ্বারা ভারতের সম্পদ কীভাবে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক গবেষক জন ম্যাকলেনের মতে, বছরে ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ নিষ্ক্রমণ হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির উপর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়। **প্রথমত**, ভারত থেকে সম্পদ নিষ্ক্রমণ বন্ধের দাবি জানানো হয়। **দ্বিতীয়ত**, দারিদ্রের ও দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য দাবি জানানো হয়। **তৃতীয়ত**, লবণ কর এবং অরণ্য আইনের কঠোরতা এবং ভারতীয় কুলিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়। **চতুর্থত**, শিল্প সংরক্ষণ নীতি, আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতি, রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা হ্রাস প্রভৃতির দাবি জানানো হয়। কংগ্রেস বহু বিষয়ে সংস্কারের দাবি জানিয়ে ছিল। কংগ্রেস সরকারের শোষণ নীতির সমালোচনা করে ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস বারবার এই দাবিগুলি জানাতে থাকে।

কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ ছাড়াও প্রশাসনের 'বিকেন্দ্রীকরণ' ও 'ভারতীয়করণের' দাবি জানিয়েছিলেন। তাছাড়া সরকার যে সমস্ত অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলি প্রত্যাহারের দাবিও তাঁরা জানিয়েছিলেন। অত্যাচারী দমনমূলক আইনগুলির মধ্যে 'জুরি আইন' (১৮২৩ খ্রিঃ), 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬ খ্রিঃ), 'অস্ত্র আইন' (১৮৭৬ খ্রিঃ), 'মিউনিসিপ্যাল আইন' (১৮৯৯ খ্রিঃ), 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' (১৯০৪ খ্রিঃ), 'বঙ্গভঙ্গ' (১৯০৫ খ্রিঃ) প্রভৃতি জনস্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সরকার রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করলে কংগ্রেস প্রতিবাদ জানায়। এইভাবে অধিকার রক্ষার সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

## 32.3 জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের সামাজিক ভিত্তি (Social Basics of Moderate Leaders in I.N.C.)

কংগ্রেসের আদি পর্ব বা প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচি একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিল না। ঐতিহাসিক অনিল শীল এই পর্যায়ে কংগ্রেসকে একটি পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন (Indeed what in 1885 was little more than an experiment)। এই যুগের কংগ্রেসের সংবিধানের অপেক্ষা ব্যক্তি প্রাধান্য বেশি ছিল। এই যুগের নেতাদের মধ্যে নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য রক্ষা করাই ছিল আসল কথা। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'গোষ্ঠী স্বার্থ ও ব্যক্তি প্রাধান্য না থাকলে কংগ্রেসের প্রকৃত ঐক্য গড়ে উঠতে পারত।' এক এক নেতাকে কেন্দ্র করে এক একটি শক্তিশালী জোট কংগ্রেসের উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পুনায় তিলক ও গোখেলকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী বম্বেতে মেহেতা ও ওয়াচা গোষ্ঠী, কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বোস গোষ্ঠী। গর্ডন জনসন জোট ও গোষ্ঠী ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রভাব ছিল বলে মনে করেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের মতকে ড. সুমিত সরকার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এই যুগে কংগ্রেসের হাতে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বা কংগ্রেস একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কংগ্রেস ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত দল।

প্রথম পর্যায়ের কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে আইনজীবীদের সংখ্যা ছিল বেশি। অনিল শীলের মতে, কংগ্রেস চাইত অভিজাত বিত্তশালীরা কংগ্রেসে যোগদান করুক। কিন্তু অভিজাত ও ভূস্বামীরা এই সময় কংগ্রেসকে সযত্নে এড়িয়ে চলত। কংগ্রেসের এই যুগের নেতারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং ইংরেজি সভ্যতা, ভাষা ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে মোহগ্রস্ত। এরা সাধারণ লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করত। এই এলিট শ্রেণির সাধারণ মানুষের প্রতি ভীতি ও ঘৃণা ছিল। এককথায় নরমপন্থী নেতারা

জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের ভারতবাসীর স্ব-নিযুক্ত নেতা বলে ভাবতেন।

ঐতিহাসিক অনিল শীল মন্তব্য করেছেন যে, কংগ্রেস কৃষকদের সহানুভূতি লাভের জন্য কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করেনি। যদিও তাঁরা ভারতবাসীর দারিদ্র্যের জন্য তাঁরা ব্রিটিশের অপশাসনকে দায়ী করতেন, তবুও তাঁরা মনে করতেন যে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় তাদের উন্নতি হবে, "নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র শিক্ষিত ও সম্পত্তিভোগী শ্রেণির ভোটাধিকারের কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা কৃষকদের ভোটাধিকার প্রদানের কথা চিন্তা করেননি। অনিল শীলের মতে, কংগ্রেস নেতাদের আত্মসর্বস্ব ভাবলে ভুল হবে। কারণ তাঁরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও তীব্র চাপের মধ্যে নীতি স্থির করতেন, তাঁদের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব ছিল না যা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে ড. সুমিত সরকার কৃষকদের প্রতি কংগ্রেসি নেতাদের উপেক্ষাকে সমালোচনা করেছেন, তাঁর মতে, "এই নেতাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণি সম্পর্কে একটি ঘৃণা ও ভীতির মিশ্রভাব ছিল........"। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁরা ব্রিটিশের ওপর নির্ভর করতেন বলে তাঁরা অনিয়ন্ত্রিত গণ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন। জাতীয়তাবাদী নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে 'তিন দিনের তামাশা' বলে বিদ্রুপ করেছেন।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সংগ্রামী মনোভাবের অভাবের জন্য তাঁদের পদ্ধতিকে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' (Political mendicancy) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরা ব্রিটিশের করুণা ভিক্ষাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন। ওই কারণে তাঁরা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন—"জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো—ইহাই আমাদের পলিটিক্স"। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম দূরের কথা, ব্রিটিশ শাসকদের সক্রিয়ভাবে বিরোধিতার কথাও নরমপন্থী নেতারা ভাবতে পারেননি। সারা বছর ধরে নিজ বৃত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকা আর বছরে একবার অধিবেশনে যোগ দিয়ে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াই ছিল প্রথম পর্যায়ের নরমপন্থী নেতাদের দেশপ্রেমের নিদর্শন। 'Subject India' গ্রন্থে ব্রেইলসফোর্ড নরমপন্থীদের সম্পর্কে লিখেছেন—"গোখলে এবং তাঁর প্রজন্ম ব্রিটিশ বিজয়কে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঈশ্বরের ঐশ্বরিক দূরদর্শিতার ফলস্বরূপই তা সম্ভব হয়েছে।" (Gokhale and his generation accepted the British conquest as an unalterable fact decreed, as I have heard him say, by the mysterious providence of God").

ভারতের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানেরা প্রথম দিকে কংগ্রেসে যোগদান করেনি। আলিগড় নেতা স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁ মুসলিম সমাজকে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে মন্তব্য করেন। সরকার ও কংগ্রেস থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে তিনি কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস গোড়া থেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেসকে দোষী করা যায় না। আলিগড় আন্দোলনই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কথায় ও কাজের মধ্যে কোনো মিল ছিল না। তাঁরা একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেন ও তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। লর্ড কার্জন গোখেল সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে জাগাতে এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেননি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব জর্জ হ্যামিলটন নৌরোজীকে বলেন যে, "আপনি নিজেকে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন বলে প্রচার করেন, আবার সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন না।" এই মন্তব্যগুলি থেকে বলা যায় যে নরমপন্থী নেতাদের এই সীমাবদ্ধতা আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

প্রকৃতপক্ষে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শ্রেণি স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের দাবিগুলি রচনা করতেন, যার ফলে তাঁরা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছেন। নরমপন্থী নেতাদের সামাজিক ভিত্তি, সম্পদশীলতা ও পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, নরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক শোষণের কথা বলেন কিন্তু দারিদ্র্য, জাতিভেদ প্রথা, অশিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। ব্রিটিশের উদারতায় নির্ভর করে তাঁরা ভুল করেন। তাঁদের ভুল যখন ভাঙে তখন কংগ্রেসে চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে গেছে। নরমপন্থী আন্দোলনের ধীরগতি ও উত্তেজনাহীনতা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রস্তুত করেছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করলে চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল আবেদন-নিবেদন মাধ্যমে সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণির মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। ফলে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাদের সাফল্য ছিল সীমিত। তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কম ছিল। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বুঝতে তাদের অনেকদিন সময় লেগেছিল। সীমিত রাজনীতির আঙিনা অতিক্রম করতে পারেনি বলে নরমপন্থীরা একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের বিদ্রূপ বা উপেক্ষার পাত্র হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে চরমপন্থীরা তাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত কংগ্রেসকে 'তিন দিনের তামাশা' এবং অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেসকে 'ভিক্ষার্থীর কংগ্রেস' বলে মন্তব্য করেছেন। লালা লাজপত রায় মন্তব্য করেন যে—"নরমপন্থীরা ২০ বছর ধরে যে আন্দোলন করেছিলেন তা [illegible] ব্যর্থ হয়েছিল। তারা চেয়েছিলেন রুটি, পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো"। স্বাভাবিকভাবেই নরমপন্থীদের রাজনৈতিক ভিক্ষা-বৃত্তি ও আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। দেশের যুবকেরা নরমপন্থী নেতৃত্বে

উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। ব্রিটিশ উদারপন্থার ওপর অগাধ আস্থা, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সমাজের উচ্চবিত্তশালী শ্রেণির স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু প্রস্তাব, জনসংযোগের অভাব, আবেদন-নিবেদন ও রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি নরমপন্থী রাজনীতিকে এক সংকীর্ণ রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হতাশার জন্ম দিয়েছিল, সেই হতাশাই ভারতবর্ষে সংগ্রামশীল চরমপন্থী রাজনীতির উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তারাই ভারতের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। নরমপন্থীদের মন্থর গতি ও ব্যর্থতা যে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও অধৈর্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল এখানেই তাদের বড়ো স্বার্থকতা। নরমপন্থীরাই ধর্মনিরপেক্ষ, উদার গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না গিয়েও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্নচিত্র তুলে ধরে ছিলেন। নরমপন্থী নেতাদের রাজনৈতিক কৌশল থেকে পরবর্তী নেতৃবন্দ শিক্ষালাভ করেছিলেন। ডঃ অশীন দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, ''জাতীয়তাবাদ শত্রুর সন্ধান ছাড়া বাঁচে না।'' নরমপন্থী নেতারা সাম্রাজ্যবাদকে শত্রুবলে চিহ্নিত করে জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করেন যার ফলে বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি উগ্র আকার ধারণ করেছিল। নরমপন্থীদের জাতীয়তাবাদে কোনো সংকীর্ণ আবেগ ছিল না। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেন—সে আন্দোলন সহিংস হোক আর অহিংস হোক।

## 33. সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ (Causes behind the rise of militant nationalism)

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই দু-দশক ধরে নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা ও তাঁদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের 'আবেদন-নিবেদনের' নীতি কংগ্রেসের একাংশের কাছে ক্রমশ অযৌক্তিক হয়ে ওঠে। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে নেতৃত্বের দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটি হল নিয়মতান্ত্রিক ধারা এবং অপরটি হল ক্রমবিকাশমান উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারা। আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন অর্জন করার পথকে যারা বরণীয় বলে মনে করেছিলেন ইতিহাসে তাঁরা 'চরমপন্থী' নামে পরিচিত। চরমপন্থী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক (মহারাষ্ট্র), বিপিনচন্দ্র পাল (বাংলা), অরবিন্দ ঘোষ (বাংলা), লালা লাজপত রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে চরমপন্থী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রমে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম, ঐতিহ্য ও ইতিহাস বোধ থেকেই এই চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব। সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হল চরমপন্থী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। চরমপন্থার উদ্ভব ও ক্রম বিকাশের ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) সরকারি ঔদাসিন্য এবং নরমপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা, (খ) মতাদর্শগত পটভূমি, (গ) অর্থনৈতিক পটভূমি, (গ) রাজনৈতিক পটভূমি, (ঘ) সামাজিক পটভূমি, (ঙ) আন্তর্জাতিক পটভূমি।

জে. আর. ম্যাকলেন লিখেছেন যে নরমপন্থী নেতাদের ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি, সংস্কার আন্দোলন এবং আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি—কোনো কিছুই ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা অব্যাহত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিত্তশালী ধনিক শ্রেণি পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এঁরা নিজেদের শ্রেণি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের উপায় হিসাবে আবেদন-নিবেদন নীতি ও সরকারের সদিচ্ছায় বিশ্বাসী ছিলেন। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা এবং তাদের দাবি পূরণে সরকারি ঔদাসিন্যে তরুণ যুবকদের মধ্যে হতাশা সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে এই হতাশা শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড়ো অংশকে গ্রাস করেছিল। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বিপানচন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ নরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতাকেই চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। অরবিন্দ ঘোষ 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির সমালোচনা করে বলেন যে সরকার কংগ্রেসের দাবিকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি বলেই কংগ্রেসের নেতাদের একাংশ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক অনিল শীল, গর্ডন জনসন, ওয়াশব্রুক প্রমুখের মতে এলিট রাজনীতিবিদদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের দশকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। বাংলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ সর্বত্রই এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। মাদ্রাজে ত্রিমুখী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চরমপন্থী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছিল বলে ওয়াগব্রুক দাবি করেন। তাঁর মতে মাদ্রাজের ভ্যাশাম আয়েঙ্গার ও সুব্রাহ্মণ্যম আয়ারের নেতৃত্বাধীন মায়লাপুর চক্র, শঙ্করণ আয়ার ও কে. আর. আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে এগ্‌মোর গোষ্ঠী এবং অন্ধ্রনিবাসী প্রকাশন, কৃষ্ণরাও ও টুটিকোরিন নিবাসী চিদাম্বরম পিল্লাই-এর নেতৃত্বাধীন বহিরাগত মফস্বল গোষ্ঠীর মধ্যে বহিরাগত মফস্বল গোষ্ঠী এগ্‌মোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে চরমপন্থী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল। সি. এ. বেহলি ও ক্রিস্টিন ডবিন অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এবং সুমিত সরকার এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, উনিশ শতকে দেশের জাতীয় জীবন, চিন্তা ও

রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রতীচ্যের যে বাহ্যিক ও ব্যর্থ অনুকরণ প্রকট হয়ে উঠেছিল তারই অনিবার্য পরিণতি ছিল চরমপন্থার অভ্যুদয়। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, রাজনারায়ণ বসু, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুঙ্কার প্রমুখের চিন্তাধারা চরমপন্থীদের ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। স্বামীজির বাণী চরমপন্থার মতাদর্শজাত ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, বাংলার চরমপন্থার উত্থানের পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল ঘোষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে স্বদেশি শিল্পোদ্যোগ, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বামীজীর 'অভী' মন্ত্র চরমপন্থীদের প্রভাবিত করে। ডঃ ত্রিপাঠী বলেন—Vivekananda was the Maichel Angelo in the realm of spirit."

উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। সমগ্র বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা প্রবল আকার ধারণ করে এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন জার্মানি ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে ব্রিটেন ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের সীমাহীন শোষণ, বৈষম্যমূলক করভার, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের শুল্ক সংক্রান্ত আইন এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের কার্পাস বস্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংকট দেখা যায়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের ফলে সীমাহীন বেকারত্ব ভারতীয়দের শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। ভারতীয় শিল্পের দুরাবস্থা কৃষির ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি পায়। চাহিদা তুলনায় উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল দুর্ভিক্ষ। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন দুর্ভিক্ষে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। দাদাভাই নৌরোজী 'দারিদ্র্য ও ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন' (Poverty and Un-British Rule in India) রমেশচন্দ্র দত্ত 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' (Economic History of India) মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে 'অর্থনৈতিক রচনাবলি' ('Indian Economy') তাঁদের মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে 'নির্গমন তত্ত্ব' (Drain Theory) এবং ব্রিটিশ শোষণের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ডঃ বিপানচন্দ্রের মতে, সম্পদ-নিষ্কাশন তত্ত্ব ভারতীয় জনগণের উপর সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ও ওয়েলবি কমিশনের সামনে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ও শোষণের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'Prosperous British India' গ্রন্থে ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম ডিগবী ভারতের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি ও দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সংকীর্ণ নীতিকে দায়ী করেন। এঁদের অর্থনৈতিক শোষণ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার অর্থনৈতিক পরিবেশ রচনা করেছিল। ডঃ বিপানচন্দ্রের মতে, 'অর্থনৈতিক শোষণসংক্রান্ত সম্পদ নিষ্কাশন মতবাদ রাজনৈতিক দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক ছিল।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিকাশে সাহায্য করেছিল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপ ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোনো প্রেরণার সঞ্চার করেনি। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের হতাশ করেছিল। এর ফলে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে একাংশ নরমপন্থীদের ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ করে সংগ্রামী আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির চরম প্রকাশ ঘটে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। লর্ড কার্জন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিনাশের জন্য দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কলকাতা কর্পোরেশন আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই সমস্ত কার্যকলাপে শিক্ষিত ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সরকারের বিরোধিতার জন্য সংগ্রামের পথ অনুসরণ করে।

ব্রিটিশ রাজের সীমাহীন শোষণের ফলে ভারতের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক সংকটের ফলে জমির উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র জমিদার ও কৃষক শ্রেণির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠায় তারা ক্রমশ হিংসাত্মক রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে এমন নেতৃত্বের অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল যাদের জাতীয়তাবাদের চরিত্র ছিল জঙ্গি, দাবি ছিল চরম এবং সংগ্রামের পদ্ধতি ছিল আপসহীন গণবিদ্রোহ। বিংশ শতকের গোড়ায় জলসেচ কর ও কৃষিকরের হার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায়ের মনে ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিল।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের বিকাশে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। যখন ভারতের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক ঘটনাবলি এক নতুন পরিবর্তনের দিকে মোড় নিতে শুধু করেছে, ঠিক সেই সময় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বামন জাপানের কাছে রুশ দৈত্যের পরাজয় চরমপন্থী সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহিত করেছিল। এরপরই রাশিয়া, চীন, মিশর, তুরস্ক ও আয়ারল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রাম ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। ইটালির ঐক্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ম্যাৎসিনি, সংগ্রামী নেতা গারিবোল্ডীর আদর্শ, রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলন, ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তিকে আঘাত হানতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

উল্লিখিত ঘটনাবলি ছাড়াও সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহায্য করেছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা ও স্বরাজ', অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম', বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরের 'নবশক্তি' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাগুলি ছাড়াও 'অমৃতবাজার', 'বসুমতী', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনে ও জাতীয়তাবাদ জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক পর্ব বাংলার রাজনারায়ণ বসু, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহারাষ্ট্রের বিষ্ণুশাস্ত্রী ও চিপলঙ্কর শুরু করেছিলেন, আদর্শগত ও আর্থ-সামাজিক অনুকূল পরিবেশে লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ তাকে দাবানলে পরিণত করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' ও 'মারাঠী' পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে সচেষ্ট হন। তিলক হিন্দুধর্ম ও মহারাষ্ট্রের অতীত ঐতিহ্যকে জাতীয় সংগ্রামের প্রক্রিয়ার রূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি 'শিবাজী ও গণপতি' উৎসবকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশে তিলকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করে এম. এ. বুচ বলেছেন—"Like Socretes, Tilak brought philosophy in India from heaven to earth, from the council Hall or the Congress mandap to the street and the market". চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও প্রগতির আদর্শে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের বাণী শোষিত জনগণের কাছে তুলে ধরলে তা সহজেই ভারতবাসীকে আকৃষ্ট করে। চরমপন্থী নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

# XXXIV

# SWADESHI MOVEMENT

## 34.1 The Partition of Bengal and Swadeshi Movement

### 34.1 বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন (The Partition of Bengal and Swadeshi Movement)

বিশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ধারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন দ্বিতীয়বার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। এই সময় কার্জন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যা দুটির একটি হল বঙ্গভঙ্গ যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ করে বাংলায় তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় সমস্যাটি হল সামরিক শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যা নিয়ে কার্জনের সঙ্গে উর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য দেখা দেয়। রাজপ্রতিনিধি হিসাবে লর্ড কার্জন কর্তৃক গৃহীত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাঙালির মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। তদানীন্তন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সচেতনতা প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়ে বাঙালি ছিল অগ্রগণ্য। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ শাসকেরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা তথা ভারতের ঐক্য ও সংহতি ভেঙে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছিল। বাঙালির প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব কার্জনকে আতঙ্কিত করেছিল। তাঁর কাছে বাংলা ছিল 'অশান্তির উৎস'। তিনি বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব কার্যকরী করেন। এই সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত তথা বাংলা জুড়ে যে আন্দোলন দেখা দেয় তা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত।

লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ব্রিটিশ শাসকদের পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের পর স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থ কোট প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাংলা ভাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রধান কমিশনার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের প্রধান কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। কিন্তু পরবর্তী আসাম কমিশনার স্যার হেনরী কটন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার নতুন করে বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি সম্বলপুর, ওড়িশাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লর্ড কার্জনকে প্রস্তাব করেন এবং বাংলা ভাগের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে অ্যান্ড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটোলাট নিযুক্ত হন। কার্জন তাঁকে প্রাদেশিক সীমান্ত পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দিলে ফ্রেজার উইলিয়াম ওয়ার্ডের পরিকল্পনার সামান্য বদল করে পেশ করেন (২৮ মার্চ, ১৯০৩ খ্রিঃ)। ফ্রেজার চট্টগ্রাম বিভাগ,

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব দেন। স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে বাণিজ্যিক সুবিধার্থে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানা ইবেটসনও প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেন। তবে একমাত্র ব্যাম্পফিল্ড ফুলার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। ফ্রেজা সর্বপ্রথম বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক সুবিধার কথা বলেন। সুতরাং দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ছিল ফ্রেজারের মস্তিষ্ক প্রসূত এ রিজলে কর্তৃক অনুমোদিত। লর্ড কার্জন এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে ফ্রেজার ছিলেন কার্জ প্রধান উপদেষ্টা। ফ্রেজারের পরামর্শে স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলের বঙ্গভঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাবটি 'রিজলে পেপার' (Risley Paper) না প্রকাশিত হয়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কার্য নির্বাহক পরিষদ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারিভাবে অনুমোদন করেন। প্রস্তাবে বলা হ শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং এই অঞ্চলের নাম হ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। অন্যদিকে ছোটোনাগপুর মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে কার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছি 'বিভেদ এবং শাসন নীতি' (Divide and Rule Policy)-র সাহায্যে বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করা। ১৯০৫ খ্রিস্টা ২০ জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, মালদহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহি, পার্বত্য ত্রিপু ও আসামকে কেন্দ্র করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি প্রদেশ গঠিত হবে। এর রাজধানী হবে ঢাকা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশায় বাকি অংশ নিয়ে গঠিত প্রদেশের রাজধানী হবে কলকাতা। ওই বছরেরই ১৬ অক্টোবর এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে ব ঘোষণা করা হয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জাতি-ধর্ম নির্বিশে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে 'জাতীয় বিপর্য বলে মনে করেন। ইংরেজদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই প্রস্তাবের নিন্দা করা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকাতে লেখা হয় যে ''১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি এমন দুর্দিনে পড়েনি।'' বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও কলকাতার কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মহামেডা অ্যাসোসিয়েশন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা জুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হ বঙ্গভঙ্গ বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। বিপিনচন্দ্র ভাষায় বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং জাতী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়। ভারত সচিব ব্রডরিককে লেখা লর্ড কার্জনের চিঠি থেকে বঙ্গভঙ্গের মূল অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। কার্জন লেখেন—''বাঙালিরা নিজেদের একটি মহান জাতি বলে মনে করে। তারা একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হবে এবং জনৈক বাবু কলকাতার লাটপ্রাসাদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষের এমন একটি শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করা হবে, অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিত ভাবেই ক্র বর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে।'' অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, ''ইংরেজ শাসকদের প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পশ্চি ও পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী হিন্দু রাজনীতির বিচ্ছেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।'' বাংলাদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরো চেতনা দমন করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। পনেরটি জেলা হারিয়ে বিভক্ত বাংলায় লোকসং হয় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ, যার মধ্যে ৯০ লক্ষ ছিল মুসলমান। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লোকসংখ্যা হল ৩ কোটি ১০ লক্ষ তার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাখীবন্ধন উৎসবের' মধ্য দি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হ ওইদিন বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন উৎসব পালিত হয়। বাংলাদেশে ওই দিনটি শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৬ অক্টো সন্ধ্যায় প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ হাজার লোকের জনসভায় আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ভাষণ দেন। ইতিপূ জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এতবড়ো জনসভা হয়নি। আনন্দমোহন বসু হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে 'ফেডারেশন হল' 'মিলন মন্দির'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে সত্তর হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয় আন্দো পরিচালনার জন্য।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পত্র-পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'সঞ্জী 'বসুমতী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সন্ধ্যা', 'স্বরাজ', 'যুগান্তর', 'বরিশাল হিতৈষী', 'বেঙ্গলি', 'বন্দেমাতরম্', 'চারুমি 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সমালোচনা করা হয়। লন্ডনের 'ডেইলি নিউজ' সংবাদপত্রে বঙ্গভ পরিকল্পনাকে ''অদূরদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক'' বলে বর্ণনা করা হয়। এছাড়াও 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান', 'পাইওনি 'টাইমস' প্রভৃতি ইংরেজি সংবাদ পত্রগুলিতেও বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়। 'ডন' পত্রিকা, 'মর্ডান রিভিউ' 'ইণ্ডি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাগুলি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান একত্রিতভাবে যোগদান করেছিল। ইতিপূর্বে কোনো আন্দোলনে সমাজের সর্ব মানুষের এমন সক্রিয় সহযোগিতা লক্ষ করা যায় না। জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যো

করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মুকুলচন্দ্র দাস, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের পাশাপাশি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আবুল কাশেম, আবদুল হালিম গজনভী, খাজা আতিকুল্লা, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। মৌলবি মুজিবর রহমান 'দি মুসলমান' পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের কথা বলেন। 'সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' এর পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি আবদুল রসুল তাঁর ভাষণে বলেন যে, ''হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই একই জন্মভূমি-বাংলাদেশ''। বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে, মসজিদে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নামাজ পাঠ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে ঢাকার নবাব সালিম উল্লাহ ও ময়মনসিংহের জমিদার আলি চৌধুরী বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরি করতে ইংরেজ সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণি সক্রিয়ভাবে যোগাদান করেনি। তবে শ্রমিক শ্রেণিকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেছিলেন। তারা শ্রমিক ধর্মঘটকে সমর্থন করে শ্রমিকশ্রেণির আস্থাভাজন হতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, ব্যারিস্টার অপূর্ব কুমার ঘোষ এবং প্রেমতোষ বোস উল্লেখযোগ্য শ্রমিক নেতা। রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘটে চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংঘটিত শ্রমিক ধর্মঘটগুলি স্বদেশি নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেছিলেন বলে অধ্যাপক সুমিত সরকারের গবেষণা থেকে জানা যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে বম্বেতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সুতরাং দেখা যায়, প্রথমে না হলেও পরে শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। 'Administration of Bengal Under Andrew Fraser 1903-08' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় যে শিল্প বিক্ষোভ এই শতাব্দীর অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় ছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি আবদুল রসুল মন্তব্য করেন যে—''আমরা যা পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের মধ্যে করতে পারিনি, বঙ্গভঙ্গ তা ছমাসের মধ্যেই করেছে। এর ফসল এক বিরাট জাতীয় আন্দোলন, যার নাম স্বদেশি আন্দোলন''। নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রাহ্য করে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নরমপন্থীদের আস্থা কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ ৭ আগস্ট টাউন হলে ''বয়কট'' প্রস্তাবে সম্মতি দেন। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন দ্রুত সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লোকমান্য তিলক পুণা ও বোম্বাইতে, অজিত সিং ও লালা লাজপত রায় পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে; চিদাম্বর পিল্লাই মাদ্রাজে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতার সাহায্যে আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। মার্কিন সাংবাদিক ভ্যালেনটাইন চিরল 'অশান্ত ভারত' গ্রন্থে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী চিত্র তুলে ধরেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বয়কট আন্দোলনকে অস্ত্র রূপে প্রথম তুলে ধরেন। তিনি বয়কটের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক গড়ে তোলার ডাক দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গোপাল কৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে বাংলার স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। বাংলার বিক্ষুব্ধ জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। পরে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট দিনটিকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ''ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন'' বলে বর্ণনা করেছেন। পিকেটিং-এর মধ্য দিয়ে বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। বয়কট আন্দোলন সফল করতে বাংলার ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে। সুরেন্দ্রনাথের মতে ছাত্ররা ছিল এই আন্দোলনের ''স্বনিয়োজিত প্রচারক''। বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে ছাত্রেরা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয়। কেউ যাতে বিদেশি পণ্য না কিনতে পারে তার জন্য ছাত্রেরা বিলাতি দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু করে। শুধুমাত্র ছাত্ররাই নয় বাংলার নারীরাও শোভাযাত্রা পিকেটিং প্রভৃতিতে এই প্রথম অংশগ্রহণ করে। সুবালা আচার্য, সরলাদেব চৌধুরানি, কুমুদিনী বসু, হেমাঙ্গিনী দাস, নির্মলা সরকার, লীলাবতী মিত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদেশি পণ্য বর্জনই শুধু নয় স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, জেলা বোর্ড, পৌর বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত, সরকারি চাকুরি বর্জন ইত্যাদি ছিল বয়কট আন্দোলনের অঙ্গ বিশেষ।

বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের অসহযোগিতা এবং স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্টির আনন্দে সমগ্রজাতি মেতে ওঠে। স্বদেশি ও বয়কট হল একই মুদ্রার দুপিঠ। বয়কটের পরিপূরক হল স্বদেশি। বয়কট নেতিবাচক আর স্বদেশির ইতিবাচক কর্মসূচি একত্রিত হয়ে ''স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম হয়''। স্বদেশি আন্দোলনের তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়—(১) গঠনমূলক স্বদেশি; (২) রাজনৈতিক চরমপন্থী; (৩) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। 'গঠন মূলক স্বদেশি' ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি ত্যাগ করে স্বদেশি শিল্প, জাতীয় শিক্ষা, গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে আত্ম সহায়তা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। একেই রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। স্বদেশি দ্রব্য তৈরির জন্য 'মেসার্স বি. কে. সেন অ্যান্ড কোম্পানি', প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল', ডঃ নীলরতন

সরকারের 'সাবান কারখানা', জে. এন. টাটার 'লৌহ ইস্পাত শিল্প' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া চিনি, লবণ, দেশলাই, ঔষধ, তাঁতের কাপড় ইত্যাদি স্বদেশি উদ্যোগে তৈরি হতে শুরু করে। গঠনমূলক স্বদেশিকে কেন্দ্র করেই এ সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতো উন্নতমানের কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। জাহাজ নির্মাণের কারখানাও এ সময় গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও নতুন প্রেরণা নিয়ে এসেছিল স্বদেশি আন্দোলন। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বদেশি দ্রব্য বিক্রি করত। নরমপন্থী নেতা গোখলে স্বদেশি আন্দোলনকে অর্থনৈতিক আদর্শ বলে মন্তব্য করেছেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনকে প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন।

স্বদেশি আন্দোলনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল জাতীয় শিক্ষা। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ডন' পত্রিকা জাতীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ নভেম্বর প্রথম রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিনয় সরকারের মতে ''রংপুর হচ্ছে বাংলার শিক্ষা স্বরাজের প্রবর্তক''। লর্ড কার্জনের 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' (১৯০৪ খ্রিঃ) এবং কার্লাইল সার্কুলার (১৯০৫ খ্রিঃ) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলেছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ৯২ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানোর জন্য জাতীয় বিদ্যালয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট করা। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকার সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে শচীন্দ্রকুমার বসুর 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' জাতীয় শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেন। অর্থ সংকট ও সরকারি বিরোধিতার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ দুর্বল হয়ে পড়ে।

গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠন মূলক কাজের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বদেশ সমাজ' ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামে সমবায় প্রথায় কৃষি, যৌথ খামার, ব্যাঙ্ক ও বিক্রয় ভাণ্ডার, গ্রামীণ বিদ্যালয় ও গ্রামীণ শিল্প এবং গ্রামের লোকদের নৈতিক শক্তির জাগরণের উপর জোর দিয়ে বলেন যে এগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটিলেই ব্রিটিশ সরকারকে বিপাকে ফেলা সম্ভব হবে। অশ্বিনী দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' গ্রামীণ বিবাদ নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা যায় যে বাংলার গ্রামে প্রায় এক হাজার গ্রাম্য সমিতি কাজ করছে।

জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কটকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নরমপন্থী নেতারা বয়কটকে সার্বিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি পণ্য বর্জন করলে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এবং তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারত সরকারের উপর চাপ দেবে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করা হবে। রবীন্দ্রনাথ বয়কটকে একটি নেতিবাচক কৌশল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে তিলক, অরবিন্দ প্রমুখেরা বয়কটকে স্বরাজ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় একটি অস্ত্র বলে মনে করতেন। শুধুমাত্র বিদেশি পণ্যই নয়, শাসনের সর্বক্ষেত্রে বয়কটকে তাঁরা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এর নাম দিয়েছিলেন 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বা 'Passive Resistance'। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নৌরোজী 'স্বরাজ' লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য রূপে ঘোষণা করে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরমপন্থী নেতারা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করলে অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত এবং চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের পুরোভাগে চলে আসেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার তাদের গোপন রিপোর্টে এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলন বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। কলকাতার 'মাড়ওয়ারী চেম্বার অব কমার্স' বয়কটের ফল মারাত্মক বলে স্বীকার করে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এই আন্দোলন পাঞ্জাবের কুড়িটি জেলায়, উত্তর প্রদেশের তেইশটি জেলায়, মধ্য প্রদেশের ১৫টি স্থানে, বম্বের চব্বিশটি স্থানে এবং মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বম্বেতে তিলক, খাপার্দে, পরাজতপে, শ্রীমতি যোগী, দিল্লিতে সৈয়দ হায়দার রেজা, মাদ্রাজে চিদাম্বরম পিল্লাই. পি. আনন্দ চার্লু, টি. এম. নায়ার, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, অজিৎ সিং, জয়পাল, মুন্সিরাম, রামগঙ্গারাম প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় স্বদেশি আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

জনসভা, পথসভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, মিটিং প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা। গ্রামে যাত্রানুষ্ঠান, মেলা ও বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে আন্দোলন প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, সভা-সমিতি ও জনমত গঠন করতে থাকে। সমিতিগুলির মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর দল', 'স্বদেশ বান্ধব', ডন সোসাইটি', 'ব্রতী সমিতি', 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর 'The Swadeshi Movement in Bengal' গ্রন্থে বলেছেন যে স্বদেশি আন্দোলনে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দরাম, সৈয়দ আবা মহম্মদ প্রমুখের লেখা স্বদেশি

বাদ জাতীয়তাবাদীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা 'ঠাকুরমার ঝুলি' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্প, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল রায়ের মতো বিজ্ঞানীদের অসাধারণ গবেষণা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল। ফলে দেখা যায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বদেশি আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলেও বাংলা তার পূর্বের আয়তন হারিয়েছিল। বিহার ও ওড়িশাকে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। বাংলাদেশের পূর্ব আর পশ্চিম অংশ যুক্ত করা হয়। এই প্রদেশের রাজধানী হয় কলকাতা। তবে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বদেশি আন্দোলনকে ভিত্তি করে যে গণজাগরণের বিকাশ ঘটেছিল তার পরবর্তীকালে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরে মানুষ এমনকি মহিলারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনেই প্রথম শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক ক্ষোভকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। জে. ম্যাকলিনের ভাষায়, 'বিভাজন ইতিহাসের বড়ো দিক'' (The Partition represents a major divide in modern Indian mistory)। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর মন থেকে ব্রিটিশ শাসনের মোহ কেটে যায় বলে অরবিন্দ ঘোষ মন্তব্য করেন। পরবর্তীকালে গান্ধিজিও স্বীকার করেন যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিনাশের পথ-প্রদর্শক। এককথায় (ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হল ভারতবাসীর প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। (খ) এই আন্দোলন ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে নির্ভর করে তোলে। (গ) পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনের উপর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। (ঘ) স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতো বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং এই সময় থেকেই বিপ্লবী কার্যকলাপের সূচনা হয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সর্বভারতীয় আন্দোলনের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত → এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে স্বদেশি ও বয়কট → স্বদেশি ও বয়কটকে কেন্দ্র করে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ → চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যাপকতা → ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ → সরকারি দমন নীতি → রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড → গান্ধিজির আবির্ভাব, অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন → আইন অমান্য আন্দোলন → সশস্ত্র বিপ্লববাদ → ভারত ছাড় আন্দোলন → ভেদনীতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ → সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাগ। (ঙ) এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি ঘটে। (চ) স্বদেশি বীমা, ব্যাংক, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'Extremist challenge' গ্রন্থে বলেছেন যে, "The movement began with a bang and ended with a whimper". (বিরাট আওয়াজ ও প্রতিধ্বনি করে আরম্ভ হলেও এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কাতর আওয়াজ করে থেমে যায়।) অনেকে মনে করেন যে সরকারি দমননীতির ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে কেবলমাত্র সরকারি দমননীতিই আন্দোলনের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। ডঃ সুমিত সরকার বলেছেন যে, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা বয়কটকে সমর্থন করলেও বিত্তশালী বুর্জোয়া ব্যবসায়ী শ্রেণি বয়কটকে সমর্থন জানায়নি। এঁদের সহায়তা ছাড়া বিদেশি পণ্যের বয়কট সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের নরমপন্থী সদস্যরা বয়কটের পক্ষে ছিল না। বাংলার বাইরে বয়কট আন্দোলনের প্রভাব ছিল সীমিত। বয়কট আন্দোলন ব্যর্থ হবার একটি প্রধান কারণ হল স্বদেশি দ্রব্যের স্বল্পতা। বয়কট গরিব মুসলিমদের উপর জোর করে চাপানোর চেষ্টা হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভারতবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কোনো কর্মসূচি গৃহীত হয়নি। শ্রমিক শ্রেণিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দান করেনি। জমিদারদের একাংশ আন্দোলনে যোগ দিলেও অনেকেই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। আবার অনেক জমিদার আন্দোলন দমনে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। মার্কসবাদীদের মতে, এই আন্দোলন ছিল অনেকাংশে এলিটিস্ট। স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দুজাগরণবাদ ছিল এক বিষম দুর্বলতা। এই হিন্দুজাগরণবাদ মুসলমানদের মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। স্বদেশি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করায় জনগণের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, সাহস, আত্মোৎসর্গের প্রভাব না থাকলেও সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা ১৯০৮ সালের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

স্বদেশি আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়নি। স্বদেশি নেতৃবৃন্দ যদি আন্দোলনের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে যু করতেন তাহলে আন্দোলন ব্যাপক ও গভীর হত। এই আন্দোলনের সঙ্গে উচ্চবর্ণের লোকেরাই বেশি জড়িত ছিলেন। সমাজে নীচুতলায় মানুষকে এই আন্দোলন অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বদেশি আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলনে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব তা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করে।

## 35.1 Role of Tilak, Pal, Aurobindo, Lajpat Rai in the Development of Millitant Nationalism

## 35.1 সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিলক, পাল, অরবিন্দ এবং লাজপত রায়ের ভূমিকা (Role of Tilak, Pal, Aurobindo, Lajpat Rai in the Development of Millitant Nationalism)

● **বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০ খ্রিঃ) :** সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রথম ও প্রধানতম প্রবক্তা হিসাবে বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান অবিস্মরণীয়। তিলক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রসারের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিলকের কার্যকলাপ মহারাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি জাতীয় সংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসাবে তাঁর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিলক ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এই সময় তিনি বিবাহের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইনের বিরোধীতা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। যদিও এর আগে তিনি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৮৪ সালে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি এবং বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজ স্থাপন করেন। অতঃপর তিলক মহারাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিস্তারের জন্য 'মারাঠী', 'কেশরী' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্র দুটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ছিল চরমপন্থীদের মুখপত্র।

মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিলক ১৮৯০-এর দশকে 'গণপতি', 'শিবাজী', 'রামদাস স্মৃতি' প্রভৃতি উৎসব প্রবর্তন করেন। সাধারণ মানুষের মনে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিলক 'গণপতি' পূজাকে সার্বজনিক উৎসবে পরিণত করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিলক 'শিবাজি উৎসব'-কে মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও মহারাষ্ট্রের অতীত গৌরবকে জাতীয় সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেন। মারাঠা নায়ক শিবাজির স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগ দেশাত্মবোধক সংগীত, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। 'গণপতি' এবং 'শিবাজি' উৎসবকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। যদিও বিচারপতি রানাডে প্রমুখ উদারনৈতিক হিন্দু সংস্কারকগণ 'গণপতি' ও 'শিবাজি' উৎসবের বিরোধিতা করেন। জাতীয় কংগ্রেসও তিলক প্রবর্তিত উৎসবকে মেনে নিতে পারেনি। তিলক কর্তৃক প্রবাহিত হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য ভিত্তিক উৎসব মুসলমানদের প্রতি অসৌজন্য মূলক বলে জাতীয় কংগ্রেস মতামত জ্ঞাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্লেগে মহারাষ্ট্রের অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ সরকারের অবহেলায় প্লেগ রোগ মহামারির আকার ধারণ করেছে এই ধারণা জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় (দামোদর চাপেকার এবং বালকৃষ্ণ চাপেকার) পুণার ম্যাজিস্ট্রেট সহ আর একজন সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করে (১৮৯৭ খ্রিঃ)। ব্রিটিশ সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিলককে দোষী সাব্যস্ত করে। বিচারে তিলককে আঠারো মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে তিলক 'বিদেশি বস্ত্র বহ্নি উৎসব' পালন করেন। এস. নায়ার, সুব্রাহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দ চার্লু তিলকের বয়কট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিলকের কারাবরণ সমগ্র দেশে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে ছয় বছরের জন্য মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়।

বালগঙ্গাধর তিলকের আদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করে এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে শক্তিশালী গণ আন্দোলন সংগঠিত করেন। মার্কিন সাংবাদিক ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁকে 'ভারতীয় বিক্ষোভের জনক' বলে অভিহিত করেন। একজন উঁচুমাপের চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও তাত্ত্বিক রূপে জনগণের মনোভাব বুঝে সেইভাবেই তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলনের দিকে চালিত করেছিলেন। ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্য, সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলে বলেছিলেন "Swaraj in my birth right and I must have it" (স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই)। তিলক জাতীয় কংগ্রেসকে গণ সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসকে তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দেন। তিলক ভারতবাসীকে ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হবার আহ্বান জানান। তবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে সশস্ত্র পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে তাঁরাচাঁদ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিলকের আদর্শ ও কার্যকলাপ

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিশীল ও গণমুখী করে তুলেছিল এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দেশনায়ক তিলকের জীবনাবসান ঘটে। মহাত্মা গান্ধি তিলক সম্পর্কে বলেন, ''এক দুর্জয় নেতা চলে গেলেন'' ("My strongest bullwork is gone")। গান্ধিজি তিলককে 'আধুনিক ভারতের স্রষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন।

## ● বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রিঃ)

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী রাজনীতি বাংলায় সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ আকার ধারণ করেছিল। বাংলার চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা বিপিনচন্দ্র পাল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি নরমপন্থী রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি নরমপন্থী রাজনীতির বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং সংগ্রামশীল জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে চিহ্নিত হন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার দ্বারা জনগণকে জাতীয়তাবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল 'নিউ ইন্ডিয়া' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হতে আহ্বান জানান। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় বিপিন চন্দ্র 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বা 'Passive resistance'-এর আদর্শ প্রচার করেন। তিলকের মতো তাঁরও মূল লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ' লাভ করা। তিনি বলেন যে, ''স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত আমরা চুপ করে বসে থাকব না বা মাঝপথে বিশ্রাম করব না।'' বিপিন চন্দ্র পাল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন না। তিনি সমাজ সংস্কারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। স্বদেশ আন্দোলন গতিহারা হলে তিনি চরমপন্থী রাজনীতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং নরমপন্থী রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতারূপে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করলে বিপিন চন্দ্র তাঁর বিরোধিতা করেন। বিপিন চন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাজ্য স্থাপনের, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণতন্ত্রী রাজ্যগুলি এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজ্য কটি। তবে এই ভারতবর্ষকে তিনি একটি স্বপ্ন বিলাস, বা খুব বেশি হলে, একটা ঐতিহাসিক সম্ভাবনার বেশি কিছু ভাবতে চাননি।

## ● অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রিঃ) :

কলকাতার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান অরবিন্দ শিক্ষালাভের জন্য ছোটোবেলা থেকেই ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। শিক্ষালাভের পর স্বদেশে ফিরে এসে তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। বরোদায় থাকার সময়ে অরবিন্দ মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে যে চরমপন্থী দলের উদ্ভব ঘটে অরবিন্দ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক রূপে অরবিন্দ দেশবাসীকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানান। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যকে তিনি দুঃসহ অমঙ্গল বলে মনে করতেন। জাতীয়তাবাদ বলতে অরবিন্দ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তি মনে করতেন না। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি ভারতবাসীর আত্মার পূর্ণ বিকাশের ধারণা পোষণ করতেন। অরবিন্দের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশরা এদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে কীভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে সে কথা তিনি কোনোদিনই ভোলেননি। ১৯০৮ খ্রিঃ মে মাসে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তিনি লেখেন যে, ''স্বরাজ হল বর্তমান অবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, সত্য যুগের জাতীয় গৌরবকে পুনরুদ্ধার করা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেদান্তের আদর্শকে প্রচার করা।''

অরবিন্দ মনে করতেন প্রতিটি জাতীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানব সমাজের হিতের জন্যেই অপরিহার্য। ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির স্বপ্ন ও সাধনার সমগোত্রীয় ছিল অরবিন্দের আদর্শ। অন্যজাতির প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। জাতীয় মুক্তি সাধনার মধ্যে তিনি বৈদান্তিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দকে ''জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও স্বাদেশিকতার কবি'' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অরবিন্দ মনে করতেন শাশ্বত মূল্যবোধ রক্ষার জন্য ভারতের কর্তব্য ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। বিষয় বিষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জনের ব্যাপারে অরবিন্দ ছিলেন আপোসহীন; স্পেন্সালারের মতোই তিনি তাঁর অবধারিত ধ্বংস ঘোষণা করেছিলেন।

অরবিন্দের আদর্শ ও কর্মপ্রয়াস যুবা সম্প্রদায়কে (বাংলার) বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভবানী - মন্দির' প্রবন্ধে অরবিন্দ দেশমাতৃকাকে শক্তির সঙ্গে তুলনা করেন এবং তাঁর এই চিন্তাধারা যুব সমাজকে উদ্দীপিত করে। তাঁরই নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাংলার গুপ্ত বৈপ্লবিক তৎপরতা আত্মপ্রকাশ করে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রতি অনীহা থাকলেও, প্রয়োজনে সে পথ গ্রহণেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহিতামূলক লেখা প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ (১৯০৭ খ্রিঃ) অভিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর বোমা মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অরবিন্দকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসাধারণ বাগ্মীতার ফলে অরবিন্দ বিনা শর্তে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের

পর অরবিন্দ আর রাজনীতিতে ফিরে যাননি, তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। বাংলার বিপ্লবীদের অবিসংবাদিত নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ 'ঋষি অরবিন্দ'-এ পরিণত হন। তাঁর রচিত 'Life Divine' বা দিব্যজীবন, উচ্চ দার্শনিক ভাবে পূর্ণ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

### ● লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮ খ্রিঃ) :

ভারতের সংগ্রামশীল জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে লালা লাজপত রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাঞ্জাবেও লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে চরমপন্থী রাজনীতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লাজপত প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্য সমাজে যোগদান করেন। তিলক ও অরবিন্দের মতো তিনিও নরমপন্থী রাজনীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। লালা লাজপত রায়ের কাছে কংগ্রেস ছিল একটি অ-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তিনি ভারতবাসীকে আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হন। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তিনি প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। লাজপত পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে 'গদর' পার্টির বৈপ্লবিক তৎপরতায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। দেশে ফিরে তিনি জনসেচ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯০৭ সালে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে মান্দালয়ে নির্বাসিত করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে আসে। সাইমন কমিশনের আগমনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ অক্টোবর লাহোরে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন লালা লাজপত রায়। ওই বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠি চার্জ করলে লালা লাজপত গুরুতর আহত হন। এই আঘাতের ফলেই ১৭ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লালা লাজপত রায়ের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বম্বের প্রথম ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হন। পাঞ্জাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য তিনি 'পাঞ্জাব কেশরী' নামে পরিচিত অভিহিত হন। লাজপত রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'New India; England's Debt to India'।